দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শিক্ষা বিভাগের আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেও এতদিন এই দুর্নাম ঘুচানোর প্রয়াস দেখা যায়নি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কখনো কখনো দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এসব করেও কোন রাজনৈতিক দল তার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। নব্বই-এর দশকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শুরু হলেও কোন দলই ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতার স্বাদ পায়নি। তাদের প্রচণ্ড লোভ-লালসার নিকৃষ্ট শিকার হতে চায়নি জনগণ। তাই বারবার ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। যদিও জনগণের ভাগ্যের এতোটুকুও পরিবর্তন হয়নি। তারা বরং তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পুড়েছে।

বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু কালো আইন প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা বিভাগের আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ অন্যতম। এই আইনটি একদিকে যেমন অস্পষ্ট, স্ববিরোধী ও অমানবিক অন্যদিকে এর অপপ্রয়োগজনিত বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হয়েছেন বেশ কিছু কর্মকর্তা। অপরদিকে বঞ্চিত হয়েছেন নিরীহ, নিরপরাধ, নীতিবান অসংখ্য শিক্ষক, যারা দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চাননি।

এই বাণিজ্য সংক্রান্ত দুর্নীতির চিত্র উপস্থাপনের পূর্বে সুযোগদানকারী এ কালো আইনটির দুর্বল দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ এর ধারা ৯-এর শিরোনাম হচ্ছে [illegible] ও হেফাজত। ধারা ৯-এর উপধারা ১-এর দ্বারা আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৯৮ কে রহিত করা হয়। ধারা ৯-এর উপধারা ২ এ বলা হয়েছে "এই বিধিতে ভিন্নতার যাহাই থাকুক না কেন, জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ১৯৯৮ এবং উক্ত বিধিমালা দ্বারা রহিতকৃত The Teachers and non-Teaching staff of Nationalised Colleges (Directorate of Public Instruction) Absorption Rules. 1981-এর অধীন আত্তীকৃত, শিক্ষক এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে যে জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি ও আর্থিক সুবিধাদি পাইয়াছেন বা পাওয়ার অধিকারী তাহা বলবৎ থাকিবে এবং তাহাদের স্ব-স্ব কার্যকর চাকুরীকাল ও সরকারী চাকুরীকালের ভিত্তিতে ক্যাডারে কর্মরত চাকুরীকাল ও সরকারী চাকুরীকালের ভিত্তিতে ক্যাডারে কর্মরত অন্যান্য শিক্ষকগণের সহিত তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে এবং এই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আত্তী কৃত শিক্ষকগণ পরবর্তীতে পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাইবেন।"

আবার ধারা-৯ এর উপবিধি ৩-এ বলা হয়েছে, এই বিধিমালা জারির পূর্বে জাতীয়করণকৃত কোন কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগ নিয়মিত না হয়ে থাকলে উক্ত নিয়োগ নিয়মিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হবে।

এখানে যেসব অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

(১) এই বিধিমালা বলতে কোন বিধিমালাকে বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কারণ ৯(২)-এর ধারাবাহিকতায় যদি উপধারা-৩ কে বিবেচনা করা যায় তবে বিধিমালা ২০০০-কে বোঝায় না।

(২) ধারা ৯-এর শিরোনামে বধকরণ শব্দটি নেই। বরং হেফাজতের নামে শিক্ষকগণকে বধ করার অবৈধ প্রয়াস চালানো হয়েছে ৯(৩)এ যা প্রতারণার শামিল।

(৩) ধারা-৯ এর উপধারা-৩ এ এই বিধিমালা বলতে আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০-কে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তবে ধারা-৭ এর উপধারা-১ এর বক্তব্য কোন শিক্ষকের এডহক নিয়োগবিধি-৬ এর অধীনে নিয়মিত হলে নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ক্যাডারের প্রভাষক পদে তার জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে এবং উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগকৃত সর্বশেষ কর্মকর্তার নিম্নে উক্ত শিক্ষকের অবস্থান নির্ধারিত হবে অনুযায়ী দেখা যায় ধারা-৯ এর ২ এবং ৩ পরস্পরবিরোধী।

(৪) ধারা-৭ এর উপাধারা-২ এ বলা হয়েছে, এডহক নিয়োগ নিয়মিত হওয়ার পর আত্তীকৃত শিক্ষকগণের পারস্পারিক জ্যেষ্ঠতা তাদের স্ব-স্ব কার্যকর চাকুরীকালের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং সমান কার্যকর চাকুরীকালের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড (ক্রাইটেরিয়া) অনুসরণক্রমে উক্ত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে। বিষয়টি খুবই অস্পষ্ট।

(৫) ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী কার্যকর হওয়া অস্পষ্ট, স্ববিরোধী ও প্রতারণামূলক কালো আইন এই আত্তী করণ বিধিমালা-২০০০ এর দ্বারা হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এমনকি অধ্যাপক পদে কর্মরত একজন শিক্ষক যার চাকরি পূর্বে নিয়মিতকরণ করা হয়নি বিধি মোতাবেক এখন তার চাকরি নিয়মিত করতে হলে তার জ্যেষ্ঠতা কিভাবে নির্ধারিত হবে?

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শতাব্দীর নিকৃষ্টতম এই কালো আইনটির কারণে সুযোগসন্ধানী কর্মকর্তারা বিশাল বাণিজ্য করেছেন। অপরদিকে বঞ্চিত হয়েছেন নীতিবান আদর্শ যোগ্যতম জ্যেষ্ঠ শিক্ষকগণ।

একটি মাত্র কলেজের বঞ্চনার চিত্র অনুধাবন করলেও দেশের সামগ্রিক চিত্রের একটি ধারণা পাওয়া যাবে। নীচে তা উপস্থাপন করা হলো :

গত ২৩-০৫-৯২ইং তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংদী মহিলা কলেজটি জাতীয়করণের ঘোষণা প্রদান করেন। ২৩-০৭-৯২ তারিখের এক পত্রে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ১০টি কলেজ সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। তন্মধ্যে ৮নং ক্রমিকে রয়েছে নরসিংদী মহিলা কলেজের নাম। এরই ধারাবাহিকতায় ১২-১০-১৯৯২ তারিখে নরসিংদী মহিলা কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়/আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১-এর অধীনে শিক্ষকদের চাকরি ১৩-০১-৯৪ তারিখে আত্তীয়করণ করা হয়।

গৌরীপুর কলেজ, ময়মনসিংহ; নেত্রকোনা মহিলা কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজের শিক্ষকগণের চাকরি আত্তীকরণ বিধিমালায় ১৯৮১-এর অধীনে নিয়মিতকরণ করা হলেও নরসিংদী সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষকগণের চাকুরী দীর্ঘদিন পর ১৭-০১-২০০১ তারিখে আত্তীকরণ বিধিমালায় ৯(২)-এর অধীনে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাসহ নিয়মিতকরণ করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রায় ৩ মাস পর আগের নিয়মিতকরণের আদেশ বাতিল না করে আত্তীকরণ বিধিমালায় ২০০০-এর আওতায় একটি স্মারক ও তারিখের উল্লেখ করে নিয়মিতকরণের সংশোধিত আদেশ জারি করা হয়। ফলে গেজেটে প্রকাশিত নিয়মিতকরণের প্রথম আদেশটি গেজেট ছাড়াই বাতিল হয়ে যায়।

তারপরই মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনের যোগসাজশে শুরু হয় শিক্ষক হয়রানি ও বাণিজ্য। যা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে নরসিংদী সরকারী মহিলা কলেজের ১৭ জন শিক্ষক পৃথকভাবে সচিব মহোদয় বরাবর দরখাস্ত পেশ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্মারক নং শা: ৯/৪/৯৯/৬৫৯ শিক্ষা তারিখ ১১-০৯-২০০১ মহাপরিচালক, মাউশি-এর অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর যে পরিমাণ দুর্নীতি ও বাণিজ্য হয়েছে তার উল্লেখ নাইবা করলাম। সবচে' বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যারা ১৯৯৫ সালে নায়েম থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে বিভাগীয় পরীক্ষা ও ২০০২ সালে সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা অদ্যাবধি পদোন্নতি তো দূরের কথা সিলেকশন গ্রেডও পাননি। অথচ তারা একদিকে যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ, অপরদিকে তাদের একাডেমিক ক্যারিয়ারও অধিকতর ভাল। এসব বঞ্চিত অসহায় শিক্ষক তাদের পরিবার, সমাজ ও ছাত্রদের মুখ দেখাতে পারছেন না। তারা জানেন না কী তাদের অপরাধ। চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেবলই লজ্জা, হতাশা আর অপমান তাদের নিত্যসঙ্গী।

সরকারের একটি বিভাগের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানেই যদি এত বৈষম্য, বঞ্চনা আর দুর্নীতির সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সকল বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি একত্রিত করলে যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরী হবে তা অনায়াসে 'গ্রিনেচ বুক'-এ স্থান পাবে।

এ প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে যথাযথ অনুসন্ধান ও সত্য উদঘাটন;

(খ) নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নতুন বিধি প্রণয়ন;

(গ) ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(ঘ) সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দানের জন্য বিষয়ভিত্তিক (কমপক্ষে ৩০০ নম্বরের) পরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) পিএসসি/বিসিএস/১০%/ আত্তীকৃত যেভাবেই ক্যাডারে প্রবেশ করেন না কেন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারী শিক্ষকদের পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি থেকে মুক্তি দিয়ে পড়ার টেবিলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর ফলে শিক্ষার মান উন্নত হবে। ছাত্ররা উপকৃত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হ্রাস পাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শিক্ষক,
নরসিংদী সরকারী মহিলা কলেজ।